দৈনিক জনকণ্ঠ
২
তারিখ SEP. 1 4 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

অর্ধ শতাব্দী পরেও ভাষা শহীদদের দেশে অগণিত নিরক্ষর!

ওবায়েদ উল হক

আমরা যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী পরাধীন ছিলাম তখন আমাদের জন্য শিক্ষা কোন বিবেচনার বিষয় ছিল না। এমনকি আমাদের শুধু অক্ষরজ্ঞানদানের কথাও কেউ ভাবত না। বরং জনসাধারণকে নিরক্ষর রাখতেই আগ্রহী ছিল শাসকেরা, বিশেষ করে বিদেশী শাসকেরা। কারণ তারা জানত "Education makes a people easy to lead, but difficult to drive; easy to govern, but impossible to enslave." কোন শিক্ষিত মানবগোষ্ঠীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব।

সুতরাং সুদীর্ঘকাল ধরে এ দেশের নিরক্ষরতা, অশিক্ষা ও পরাধীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত বিশাল জনগোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষে মানবেতর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। বর্ণ পরিচয় না থাকায় নিজেদের নাম লিখতে অক্ষমতার কারণে কাগজে আঙ্গুলের টিপসই দিয়ে কত লোক স্বদেশী শোষকের দ্বারা শোষিত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে তার কোন হিসাব-নিকাশ নেই। কলম ধরতে পারত না বলে নিজেদের আঙ্গুলের কালিতে কত অগণিত অজ্ঞের ভাগ্য কালিমালিপ্ত হয়েছিল তা নিরূপণ করা সহজ নয়।

কিন্তু একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের সিকি শতাব্দীর অধিককাল পরেও আমরা অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারছি না কেন তা ভাবতে গেলে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে এ দেশেরই সন্তানেরা ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল, অথচ সেই ভাষা শহীদদের দেশে, আজো কয়েক কোটি মানুষ একেবারেই নিরক্ষর। এমন প্যারাডক্স আর হয়?

শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়ে থাকে। এ বছরও ৭ সেপ্টেম্বরে এই দিবস পালিত হয়েছে। এ দেশেও ঐ রুটিনের ব্যত্যয় হয়নি। সভাসমাবেশ-সেমিনার হয়েছে। বাণী-বিবৃতি প্রচারিত হয়েছে। শিক্ষা সকল নাগরিকের জন্মগত অধিকার, মৌলিক অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার-- এসব সত্যের জোরালো পুনরুক্তি করা হয়েছে। শিক্ষা ছাড়া মানুষের বুদ্ধি, মেধা, কর্মশক্তি, দক্ষতা, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে না-- এই অনস্বীকার্য সত্য তো পুনর্ব্যক্ত করতেই হয়, বিশেষত এই দিবসে। নতুবা এমন দিবসের কোন তাৎপর্যই থাকে না। এতে অবশ্যই এ বিষয়ে সরকার ও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। আমাদের বিশ্বাস, বিশেষ করে শিক্ষা সম্পর্কে এরূপ আলাপ-আলোচনা আরও বেশি, আরও পুনঃপুনঃ হওয়া জরুরী। এমনকি হৈচৈও! শিক্ষা যে ব্যক্তি জীবনের মতো জাতীয় জীবনের পূর্ণ সার্থকতার জন্যও একেবারেই অপরিহার্য ও বিকল্পহীন, সুতরাং জাতীয় কর্মকাণ্ডে এর অগ্রাধিকার যে অনিবার্য এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি আমাদের চেতনায় সদাজাগ্রত রাখতে হবে। আমাদের চিরন্তন দারিদ্র্য ও ক্ষুধার অভিশাপ, মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক যে দারিদ্র্য সীমার নিচে নির্বাসিত, তৃতীয় বিশ্বের নিঃস্ব অনুন্নত জাতি হিসেবে আমাদের পরিচয়ের প্রধান কারণ অশিক্ষা। অর্থনৈতিক উন্নতির মূলেও শিক্ষা-- এ কথা বলা একেবারেই বাহুল্য। এটা স্পষ্ট যে যেখানে শিক্ষার হার বেশি সেখানে মাথাপিছু আয়ের হারও বেশি। যে দেশে শিক্ষার হার খুব কম সে দেশে মাথা থাকলেও উল্লেখ করার মতো আয় থাকে না-- তা নির্দ্বিধায় বলা চলে। সে দেশ অবশ্যই পশ্চাৎপদ এবং শিক্ষাহীনতার কারণে আরও পশ্চাতে সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়ত তৃতীয় বিশ্ব থেকে সরে গিয়ে চতুর্থ বিশ্বের বাসিন্দা হয়ে যাবে। শিক্ষার অভাবে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও সমস্যার অন্ত নেই। স্বাস্থ্যরক্ষার অতিশয় সাধারণ জ্ঞান না থাকায় প্রতিরোধযোগ্য নানান রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবছর মারা যায়। টেলিভিশনে যখন এখনও প্রায়ই খাওয়ার আগে হাত ধোয়া এবং মলত্যাগের পর সাবান বা ছাই দিয়ে হস্ত প্রক্ষালনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদনের হাস্যকর দৃশ্য দেখানো হয় তখন যুগপৎ দুঃখ ও লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। এই সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে সমাগত একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে নিধিরামদের।

এর কারণ, যে হারে সাক্ষরতা অর্জিত হচ্ছে তাকে আর যাই হোক সন্তোষজনক বলা যায় না কিছুতেই। সহজেই আত্মতুষ্টি বা আত্মপ্রসাদ লাভ করা আমাদের একটি জাতীয় ব্যাধিবিশেষ। সাক্ষর আর শিক্ষিত মোটেই এক কথা নয়। অক্ষর পরিচয় থেকে শব্দ গঠনের মধ্যে বেশ কিছু দূরত্ব রয়েছে। বাক্য নির্মাণ তো আরও দূরে। নাম লিখতে কলম ভাঙ্গা এবং লিখতে-পড়তে পারার মধ্যেও ব্যবধান খুব কম নয়। এ পার্থক্যটা মনে রাখলে জনশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতির হার নিয়ে সন্তুষ্টির কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। কেবল অক্ষর চিনলেই চিঠি পড়ার জন্য শিক্ষিত লোকের খোঁজে ছোটাছুটির প্রয়োজন ফুরাবে না। তাই যে পর্যন্ত ঘরে ঘরে চিঠি লিখতে ও পড়তে জানা লোক না পাওয়া যাবে সে পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার হারকে সন্তোষজনক বলা যাবে না। বাংলাদেশের অনেক গ্রামেই পানি আর্সেনিক বিষে বিষাক্ত এবং অনেকেই এ বিষে আক্রান্ত। সংবাদে প্রকাশ, এসব গ্রামে আর্সেনিক শব্দটি 'আচানক' নামেই উচ্চারিত হয়। তাহলে এসব লোকের শিক্ষা তো দূরের কথা, অক্ষরজ্ঞানও এখনও শুদ্ধ নয়। সাক্ষর বলে তাদের পরিচিত করা এক প্রকার অমার্জনীয় প্রতারণা। গোটা জাতিকেই প্রতারণার শামিল। দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারাটি প্রয়োগ না করা গেলেও তা অপরাধই থেকে যায়। এ কথা বলার উদ্দেশ্য বিশেষভাবে কাউকে দোষী বা দায়ী করা নয়, বরং এ সত্যটাই জোরালোভাবে ব্যক্ত করা যে কেবল সাক্ষর হলেই এবং স্বাক্ষর করতে পারলেই কোন জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়। এ জন্য অন্তত চিঠিপত্র লিখতে ও পড়তে পারা অত্যাবশ্যক।

গণশিক্ষা ও সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে কিছু বেসরকারী সংস্থাও কাজ করে যাচ্ছে। গত ৮ সেপ্টেম্বরে বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেছেন, বর্তমানে দেশের ৪০ লাখ নিরক্ষর লোক সরকারী পর্যায়ে সাক্ষরতা অর্জন করছে, যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা হচ্ছে ২৫ লাখ। এ ছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে ১০ লাখের বেশি লোক সাক্ষরতা অর্জনে ব্রতী। দেশকে নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার সদুদ্দেশ্যে, অনেক বিদেশী অর্থ সাহায্যপুষ্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এতে কে কতটা উপকৃত হচ্ছে সঠিক বলা মুশকিল। আশা করি দেশের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অভাব-অনটনকে পুঁজি করা নয়, বরং প্রকৃত সেবার মাধ্যমে এসব থেকে দেশকে মুক্ত করার সদিচ্ছাই এখানে প্রবল। এরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে নয়, অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গেই জড়িত। এ বিভাজন লক্ষ্য অর্জনে কোন জটিলতা সৃষ্টি করে কিনা জানি না! যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে এ ক্ষেত্রে আমাদের অল্প সময়ে আরও অনেক দূর যেতে হবে। এখনও দেশের অধিকসংখ্যক জনগণ অশিক্ষা ও অজ্ঞতার গাঢ় অন্ধকারে পথহারা, নিরুদ্দিষ্ট। আরও আগে থেকে সংশ্লিষ্ট মহলগুলো এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী হলে এবং জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দেশের বিপুল জনসংখ্যা শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে এভাবে বঞ্চিত হতো না। দেশও এত পিছনে পড়ে থাকত না। বর্তমান সরকার শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ বেশ বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু অল্প সময়ে অতীতের বিপুল ঘাটতি পূরণ সহজসাধ্য নয়। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এটাকে আরও দুঃসাধ্য করে দিচ্ছে। তাই বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ক্র্যাশ কর্মসূচীর, বৈপ্লবিক পদক্ষেপের, আরেক সংগ্রামের। এ ক্ষেত্রে অতি প্রত্যাশিত সফলতা অক্ষয় কীর্তি হয়ে থাকবে।